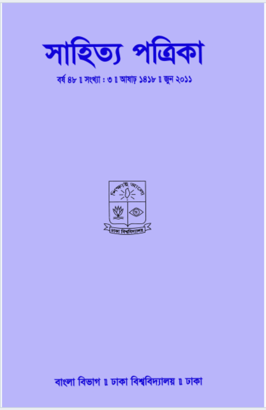

Vol. 48 | No. 3 | 2011

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা প্রবাদ : দ্যোতিতের ভাষা-দর্শন

Volume	48
Issue	3
Year	2011
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Syed Shahrier Rahman
Published online	June 1, 2011
DOI	10.62328/sp.v48i3.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v48i3.6
Pages	১০৩-১১৩
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা প্রবাদ : দ্যোতিতের ভাষা-দর্শন

Check for updates

সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান*

একটি ভাষা সম্প্রদায়ের জীবন-ঘনিষ্ঠ ক্লাসিক উপলব্ধিপুঞ্জকে ঠাস-বুনোটে ধারণ করে রাখে প্রবাদ। সাধারণ মানুষের অমিত জীবনার্থের নির্যাস একটি প্রবাদের হয়ে ওঠার মূল প্রাণশক্তি। এ কারণে প্রবাদে যা বলা হয় বা বলতে চাওয়া হয় তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত হয়ে যায় বাগর্থের (linguistic meaning) গভীরতর দর্শন। প্রবাদকে যদি একটি নৃগোষ্ঠীর জীবনজাত ভূয়োদর্শনের দ্যোতনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়, তবে এর দ্যোতিতরূপী বাগর্থকেও এক বিশেষায়িত দার্শনিক অভিঘাতের মুখোমুখি হতে হয়। ফলে, ওই প্রবাদের অন্তস্তলে লুকিয়ে থাকা ব্যঞ্জনা বহন করে চলে অনিঃশেষ দার্শনিকতা; যাকে বর্তমান প্রবন্ধে সংজ্ঞায়িত করা হবে দ্যোতিতের ভাষা-দর্শনরূপে। ভাষার প্রায়োগিক স্তরে একটি প্রবাদ যে দ্যোতনা সঞ্চার করে তার দ্যোতিত হিসেবে সক্রিয় থাকে প্রবাদটির বাগর্থ। অর্থাৎ, ওই নির্দিষ্ট প্রবাদটির জুৎসই প্রয়োগের মধ্য দিয়ে একজন ভাষা ব্যবহারকারী যা বোঝাতে চায় তা আসলে প্রবাদটির দ্যোতিত রূপ। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, একটি প্রবাদের পদ-কাঠামো কখনো আলংকারিক ভাষায়, কখনো রূপক কিংবা প্রতীকের বর্ণিলতায়, কখনোবা মিথিক সূত্রসন্ধানে যা উপস্থাপন করে তার প্রথম এবং প্রধান অভীষ্ট হলো, বিশেষ কোনো দ্যোতিত-তাৎপর্য প্রদান করা। উদাহরণস্বরূপ নিচের তিনটি বহুল প্রচলিত প্রবাদকে গ্রহণ করা যেতে পারে :

১. শাক দিয়ে মাছ ঢাকা।
২. অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।
৩. নানা মুনির নানা মত।

প্রতিটি প্রবাদেই প্রতীক চিহ্নের আশ্রয়ে মানব জীবনের চিরায়ত ও বাস্তবতা-ঘনিষ্ঠ কিছু উপলব্ধিকে সংহতভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। লক্ষণীয় যে, প্রতি ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত শব্দগুলো বিশেষ কোনো অন্তর্নিহিত বাগর্থকে তুলে ধরতে চেষ্টা করছে। বাংলাভাষীরা যখন উল্লিখিত প্রবাদগুলো যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করে তখন সংশ্লিষ্ট পরিবেশের বক্তা এবং শ্রোতা উভয় পক্ষের কাছেই প্রবাদগুলোর মর্মার্থ সুস্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, 'শাক দিয়ে মাছ ঢাকা' প্রবাদে 'শাক' কিংবা 'মাছ' শব্দ সরাসরি নয় বরং এদের সাহায্যে দ্যোতিত সংহিতাগুলোই ভাষিক যোগাযোগে মূল ভূমিকা পালন করে। বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে, আমরা যদি প্রবাদ-২-এর সঙ্গে প্রবাদ-৩ তুলনা করে দেখি। প্রবাদদুটিতে ব্যবহৃত শব্দবন্ধ আলাদা অথচ এরা উভয়ই কমবেশি একই ধরনের দ্যোতনা সঞ্চার করে। ফলে, একটি প্রবাদের দ্যোতক বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে ভাষীদের সংবেদনশীল মনস্তত্ত্বকে সরাসরি আন্দোলিত করবার লক্ষ্যে প্রবাদটির দ্যোতিতকে সামনে এগিয়ে দেয়। প্রবাদের এই দ্যোতিত রূপটি আমাদের উপলব্ধিকে যেভাবে এবং যে প্রক্রিয়ায় নাড়া দেয় সেই

* সহকারী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কৌশল বিশ্লেষণের জন্য দরকার আধুনিক ভাষা-দর্শনের যথাযথ নির্দেশনা। প্রবাদ যেহেতু একটি জনগোষ্ঠীর স্বোপার্জিত দার্শনিক উপলব্ধিকে দীর্ঘ কাল ধরে ধারণ করে চলে সেহেতু প্রবাদের ভাষাগত বিশ্লেষণ করতে গেলে ভাষা-দর্শনের তত্ত্ব-কাঠামো অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই ব্যবহার করা যেতে পারে। আর এর মধ্য দিয়ে জানা যেতে পারে, কীভাবে একটি প্রবাদের বাগর্থ বহু স্তরে দ্যোতিত হয়ে প্রবাদটিকে সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত একটি জনগোষ্ঠীর জীবনে তাৎপর্যময় করে রাখে। এই লক্ষ্যে বর্তমান আলোচনায় ভাষা-দর্শনের ব্যাখ্যান-কৌশল ব্যবহার করে আমরা বাংলা প্রবাদের বাগর্থগত দ্যোতনা বিশ্লেষণ করতে সচেষ্ট হব।

এক

বাগর্থের আলোচনা ভাষা-দর্শনের কেন্দ্রীয় বিষয়। এই জ্ঞানশাখা অনুসারে কোনো একটি ভাষিক পদগুচ্ছ কী অর্থ বহন করছে তা যেমন বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, তেমনি ওই বাগর্থ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই দুইয়ের প্রথমটি নিয়ে অস্পষ্টতা তেমন নেই। মানব ভাষার বাগর্থ নির্ণয়ের দায়িত্বপালনকারী বাগর্থতত্ত্বের (semantics) আলোকে রীতিসিদ্ধভাবেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আরও সহজ করে বলা চলে যে, কোনো ভাষার একটি পদ বা পদগুচ্ছ যে দ্যোতনার জন্ম দেয় বাগর্থতত্ত্ব তার দ্যোতিতকে ভাষা-দর্শনের পটভূমিতে চিহ্নিত করে। কিন্তু, বাগর্থের সাহায্যে ভাষা বিশ্লেষণই ভাষা-দর্শনের একমাত্র দায়িত্ব নয়; তাছাড়া একটি দ্যোতিতের বাচ্যার্থ (denotation) যেমন থাকে তেমনি এক বা একাধিক গূঢ়ার্থও (connotation)-এর সঙ্গে অন্বিত হতে পারে। বাংলাভাষীরা দৈনন্দিন জীবনে কেবল বাচ্যার্থ-বাহী বাক্যই ব্যবহার করে না, সুগভীর গূঢ়ার্থ-সংবলিত বাক্যও প্রয়োগ করে থাকে। বিশেষত, প্রবাদ ব্যবহারের সময় অনিবার্যভাবেই গূঢ়ার্থের দ্যোতনা বক্তার বক্তব্যে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। একজন বাংলাভাষী যখন 'নিজের পায়ে কুড়াল মারা' প্রবাদটি ব্যবহার করেন তখন সংগত কারণেই 'নিজের পা', 'কুড়াল' প্রভৃতি শব্দ আক্ষরিক বাচ্যার্থের সীমা পেরিয়ে গভীরতর প্রতীকী ব্যঞ্জনায় বক্তার অন্বিষ্টকে সংজ্ঞাপিত করে। এ কারণেই ভাষা-দর্শনের অপর কাজ হলো, বিশ্লেষিত ভাষিক বাগর্থের প্রকৃতি কীরূপ তা নির্ণয় করা। এ যেন অনেকটা বাগর্থ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার তাৎপর্য-অনুসন্ধান, যার সাহায্যে ভাষীদের ব্যবহার করা শব্দ, বাক্যসহ বিবিধ পদ বা পদগুচ্ছ নির্দেশিত দ্যোতিত বা দ্যোতিত-সমষ্টি অনুধাবনযোগ্য হয়ে ওঠে। তাই একে আধুনিক ভাষা-দর্শনের পরিভাষায় অধিবাগর্থতত্ত্ব (meta-semantics) বলা হয়ে থাকে। বলা যেতে পারে, ভাষা-দর্শন হলো বাগর্থতত্ত্ব ও অধিবাগর্থতত্ত্বের সমন্বিত বিশ্লেষণ-ক্ষেত্র। অধিবাগর্থতত্ত্বের সাহায্যে দ্যোতিতের বাগর্থ-বৈশিষ্ট্য নিরূপণের যে প্রক্রিয়া ভাষা-দর্শনে ব্যবহৃত হয় তা একইসঙ্গে এবং অনিবার্যভাবে বাগর্থের প্রয়োগের দিকটিও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে থাকে। কেননা, দৈনন্দিন জীবনে মানুষে মানুষে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে কী তাৎপর্যে ভাষা প্রযুক্ত হচ্ছে তাকে বাদ দিয়ে ভাষার বাগর্থকে বিশ্লেষণ করতে গেলে তা কোনোভাবেই পূর্ণাঙ্গ দ্যোতনার স্বরূপ উন্মোচনে সক্ষম হয় না। তাই বাগর্থের এই প্রায়োগিক বিশেষত্ব যা প্রকৃতপক্ষে প্রয়োগতত্ত্বের (pragmatics) সীমায় আলোচিত হয়ে থাকে, তার সঙ্গেও অধিবাগর্থতত্ত্বের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে,

বর্তমান প্রবন্ধে অধিবাগর্থ বিষয়ক আলোচনাই প্রাধান্য পাবে, এর সঙ্গে সম্পর্কিত প্রয়োগতাত্ত্বিক বিভিন্ন দিক সংক্ষেপে উল্লেখিত হবে। বস্তুত, অধিবাগর্থতত্ত্ব মানব ভাষায় ব্যবহৃত বাগর্থ ও তার প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্যকে সুসমন্বিত করে ব্যাখা করে এবং এর মধ্য দিয়ে ভাষা-দর্শনের বিভিন্ন দিকে আলোকপাত করে। এ কারণে, বাগর্থের গভীরতর ও বহুস্তরিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে কোনো একটি ভাষার বিশেষ কোনো ভাষিক অনুষঙ্গের সঙ্গে সম্পৃক্ত দ্যোতিত বা দ্যোতিত-সমষ্টির দর্শনকে অনুধাবন করা সম্ভব।

দুই

ভাষায় বাগর্থের বিন্যাস জটিল এবং বহুমাত্রিক একটি বিষয়। একটি বাক্যের কিংবা একটি পদগুচ্ছের প্রতিটি পদ স্বতন্ত্রভাবে যেমন বাগর্থ বহন করে তেমনি এদের পরস্পর-অন্বিত বাগর্থ-বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান। বাগর্থের এই বিবিধ বিন্যাস নিরূপণের জন্য অধিবাগর্থতত্ত্বের একটি কাঠামো নির্ধারণ করা যায়। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বর্তমান প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বাংলা প্রবাদ। প্রবাদের স্তরবহুল অর্থদ্যোতনার উল্লেখ ইতোমধ্যেই করা হয়েছে। এই পর্যায়ে এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্ট করা হবে। আর সে কারণেই প্রবাদসংক্রান্ত কোনো অধিবাগর্থতাত্ত্বিক কাঠামো প্রণয়নের ক্ষেত্রে এর বহুস্তরবিশিষ্ট বাগর্থের ধারণক্ষমতাও বিবেচনা করার প্রয়োজন হবে। এই লক্ষ্যে প্রথমেই আমরা প্রবাদ নয় এমন একটি বাক্যের দৃষ্টান্ত ব্যবহার করতে পারি :

৪. সুমন দৌড়ায়।

এই বাক্যটির বাগর্থ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে দুটো দিক বিবেচনা করা প্রয়োজন : এক. বাক্যটি কোনো কিছুর পরিচয় বহন করতে পারে, অথবা, দুই. বাক্যটি কোনো কিছুকে ব্যাখ্যা করতে পারে। বিষয় দুটিকে আমরা নিচে স্বীকার্যের আকারে দেখাতে পারি। বাক্যটি যদি কোনো কিছুর পরিচয় বহন করে, তবে —

স্বীকার্য-১. বাক্য *ব* এর অর্থ হবে *অ*।

আর যদি বাক্যটি কোনো কিছুকে ব্যাখ্যা করে, তবে —

স্বীকার্য-২. বাক্য *ব* বলতে *অ* বোঝাবে।

উদাহরণ ৪-কে এবার এই দুটি বিকল্পের কোনটিতে ব্যবহার করা যায় তা দেখে নেওয়া যাক। প্রথম স্বীকার্য অনুসারে 'সুমন দৌড়ায়' বাক্যটির অর্থ হলো 'সুমন' নামের একজন ব্যক্তি 'দৌড়ানো' নামক ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। অপরপক্ষে, দ্বিতীয় স্বীকার্য অনুসারে বাক্যটি বলতে 'সুমন'-এর দৌড়ানোর স্বভাব বা অবস্থাকে বোঝায়। বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে যদি একটি প্রবাদ বাক্যের সাহায্য নেওয়া হয়। নিচের উদাহরণ দ্রষ্টব্য :

৫. ধান ভানতে শিবের গীত।

এই প্রবাদে প্রথম স্বীকার্যটি প্রয়োগ করলে আমরা যে অর্থ পাই তা হলো : 'ধান ভানা'-র আক্ষরিক অর্থ বাচ্যার্থের সীমা অতিক্রম করে কোনো একটি ক্রিয়ার প্রসঙ্গকে প্রতীকায়িত

করে তথা এর পরিচয় বহন করে। এর সঙ্গে যদি ভিন্ন একটি প্রসঙ্গের অবতারণা ঘটে যা একেবারেই খাপছাড়া তবে তাকে 'শিবের গীত'-এর প্রতীক চিহ্নের সাহায্যে অভিহিত করা যায়। অপরদিকে, দ্বিতীয় স্বীকার্য প্রয়োগ করে দেখা যায় যে, প্রবাদ বাক্যটি বলতে এক প্রসঙ্গের মধ্যে সম্পর্কহীন আরেকটি প্রসঙ্গ ঢুকিয়ে দেওয়া বোঝায়। আপাতদৃষ্টিতে স্বীকার্য দুটিকে খুব যুক্তিযুক্ত মনে হলেও এদের সীমাবদ্ধতাগুলো আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। এদের প্রথম সীমাবদ্ধতা হলো এরা একে অপরের বিকল্প না সম্পূরক তা স্পষ্ট নয়। দ্বিতীয়ত, এরা বাক্যের অর্থকে মুখ্য বিবেচনা করলেও যাথার্থ্যকে (material biconditional) এড়িয়ে যায়। প্রসঙ্গত, যাথার্থ্য বলতে আমরা কী বুঝব তা স্পষ্ট করা প্রয়োজন। কোনো বাক্যের যাথার্থ্য হলো তাই যা বাক্যটিকে সাংস্কৃতিকভাবে সত্য করে তোলে। অর্থাৎ, আমরা যদি উদাহরণ-২ আর উদাহরণ-৩ মিলিয়ে নিয়ে বলি :

৬. *নানা মুনিতে গাঁজন নষ্ট। [(*) চিহ্ন দিয়ে ভাষাবিজ্ঞানে কোনো ধরনের ব্যাকরণিক বা প্রায়োগিক ভ্রান্তিকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।]

স্বাভাবিকভাবেই বাংলা ভাষিক সংস্কৃতিতে এই প্রবাদটি যথার্থ নয়; আর এ কারণে সত্যও নয়। অথচ, দুটি স্বীকার্যই নিজেদের মতো করে এই প্রবাদটির একরকম বাগর্থতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে সক্ষম। সুতরাং, বাগর্থ ব্যাখ্যা করলেই তা অধিবাগর্থতাত্ত্বিক কোনো কাঠামো প্রদান করতে পারে না। বাক্যের অধিবাগর্থতাত্ত্বিক কাঠামো প্রণয়নের জন্য সত্য-শর্ত (truth condition) পূরণ হওয়াও বিশেষভাবে জরুরি। সহজ করে সত্য-শর্তের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলা চলে যে, একটি বাক্যের বাগর্থগুণ তখনই থাকবে যদি বাক্যটি সত্য হয়। অর্থাৎ, বাক্যটি যে বাগর্থ বহন করবে তাকে অনিবার্যভাবে কোনো না কোনো সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এ কারণে রূপকথার গল্পে ব্যবহৃত বাক্যের নিতান্ত অবাস্তব কোনো বক্তব্যের জন্যেও একটি আপাত-যৌক্তিক বাগর্থসূত্রের প্রয়োজন হয়। কিন্তু মজার বিষয় হলো, আমাদের উল্লিখিত দুটি স্বীকার্যের কোনোটিই বাক্যের সত্য-শর্ত পূরণ হলো কি না তা নির্ণয় করতে অপারগ। এ কারণে অধিবাগর্থতাত্ত্বিক কাঠামোর জন্য আমাদের নতুন স্বীকার্যের প্রয়োজন হবে। প্রাসঙ্গিকভাবে স্মরণ করা যায় যে, ডেভিডসন (১৯৬৭) বাক্যের সত্য-শর্তের ওপর নির্ভর করে সত্য-শর্তমূলক বাগর্থতত্ত্বের একটি ধারণা উপস্থাপন করেন। তিনি ওপরের দুটো স্বীকার্যই বাতিল করে দিয়ে নতুন একটি প্রস্তাব দেন, আর তা হলো :

স্বীকার্য-৩ বাক্য *ব* সত্য হবে যদি এবং কেবল যদি এটি *অ* হয়।

এখানে 'যদি এবং কেবল যদি' বলতে বাক্যের সেই যাথার্থ্যকে বোঝায় যার কারণে একটি বাক্য তার সত্য-শর্ত পূরণ করে। একইসঙ্গে *অ* হলো বাক্যের সেই সত্য-শর্ত পূরণকৃত বাগর্থ। অর্থাৎ, বাক্যকে যথার্থভাবে বাগর্থপূর্ণ হতে হলে সত্য হতেই হবে।

সত্যগুণ যেহেতু বাক্যের আবশ্যিক উপাদান সেহেতু প্রশ্ন জাগে, এই সত্যের প্রকৃতি কীরূপ। কীভাবে এই সত্য বাক্যে ব্যাপ্ত হয়? এক্ষেত্রে প্রথমেই বলে নেওয়া প্রয়োজন যে, বাক্যের একেকটি পদ বা একেকটি শব্দের পরিচয় প্রদানের ভিত্তিতে বাক্যের বাগর্থ নির্ধারিত হয় না। আবার উদাহরণ ৪-এ ফিরে তাকালে দেখতে পাব, 'সুমন', 'দৌড়ায়'

অংশগুলো আলাদাভাবে বাক্যের বাগর্থের অংশীদার নয় বরং এরা মিলে মিশে এক হয়ে পুরো বাক্যটির বাগর্থের কারিগর। তাদের নিজনিজ পরিচয় থাকলেও পুরো বাক্যের জন্য তাদের সমন্বিত এবং একক একটি পরিচয় আছে। সুতরাং, প্রথম স্বীকার্য আর একেবারেই খাটছে না। আর যেহেতু বাগর্থ নির্ধারিত হয় মুখ্যত বাক্যকে অবলম্বন করে, সেহেতু সত্য-শর্ত পূরণের বিষয়টিও বাক্য-ভিত্তিক; অর্থাৎ, সকল সত্য বাক্যই একই অর্থ বহন করে না। একেকটি বাক্যে বাগর্থতাত্ত্বিক সত্যের কাঠামো একেক রকম। এ প্রসঙ্গে, আবার ফিরে যেতে পারি প্রবাদ ২ এবং ৩-এ। আগেই বলা হয়েছে যে, উদাহরণে উল্লিখিত প্রবাদ বাক্য দুটি বাংলাভাষী সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে কমবেশি একই অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং বাক্য দুটি সত্য-শর্তও পূরণ করে। তাহলে প্রশ্ন জাগে, সত্য বাক্যগুলো কি অভিন্ন অর্থও বহন করতে পারে? নিবিড় বিবেচনায় লক্ষ করা যায় যে, বাগর্থগত সাযুজ্য থাকা সত্ত্বেও 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' এবং 'নানা মুনির নানা মত' প্রবাদ বাক্য দুটি প্রামাণ্যতায় অভিন্ন নয়। ইংরেজি দুটি শব্দ 'ট্রু' এবং 'ফ্যাক্ট'-এর পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারলে বিষয়টি অনুধাবন করা সহজ হয়। কোনো বাক্য সত্য হলেই তা একইভাবে প্রামাণ্য হবে এমনটি নাও হতে পারে। উল্লিখিত দৃষ্টান্ত দুটি যে সত্য এবং তাদের ব্যবহারগত দিক থেকে যে বিশেষ মিল রয়েছে তা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই, কিন্তু প্রবাদ 'বাক্যাংশ' দুটি যা বলে তা অভিন্ন সত্যকে প্রমাণ করে না। 'অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট' প্রবাদটির অন্তস্তলে রয়েছে সংখ্যাধিক্যের কারণজাত ভণ্ডুল হয়ে যাওয়া ক্রিয়াশীলতা আর 'নানা মুনির নানা মত' প্রবাদটির মূলে রয়েছে বহুজনের বহুমতজনিত সিদ্ধান্তহীন অচলাবস্থা। সুতরাং, প্রবাদ দুটি সাদৃশ্যপূর্ণ সত্যের কথা বললেও অভিন্ন কোনো সত্যকে প্রমাণ করে না।

প্রবাদের বাগর্থ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে খুব সহজ এবং প্রচলিত পন্থা হলো প্রতিটি প্রবাদের জন্য একটি মানে ঠিক করে দেওয়া। অর্থাৎ, *ক* প্রবাদের মানে হলো *অ*। এরকমভাবে বাগর্থ-নির্দেশের মধ্যে বেশ কিছু যৌক্তিক অসংগতি রয়েছে। প্রবাদের অর্থ প্রয়োগনির্ভর। অর্থাৎ, প্রায়োগিক ভিন্নতায় প্রবাদের অর্থে নানাবিধ বিক্ষেপ বা বিচ্যুতি ঘটতে পারে। প্রসঙ্গত, নিচের উদাহরণ দুটি লক্ষ করা যেতে পারে :

৭. লোভে পাপ পাপে মৃত্যু জেনেও মানুষ লোভ করে।
৮. লোভে পাপ পাপে মৃত্যু কথাটি এখন আর সত্য বলে মনে হয় না।

বাক্য দুটিতে 'লোভে পাপ পাপে মৃত্যু' পদবন্ধটি কি অভিন্ন অর্থ বহন করছে? উদাহরণ ৭-এ পদবন্ধটি সত্য-শর্ত পূরণ করেও এর বাস্তব বৈপরীত্যকে তুলে ধরছে। উদাহরণ ৮-এ বাক্যিক না-বোধকতার মধ্য দিয়ে বর্তমান সময়ে পদবন্ধটির অসারতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, *ক* প্রবাদ বাক্যের মানে হলো *অ* — এই কাঠামোটি প্রকৃতপক্ষে প্রবাদের সামগ্রিক ও প্রায়োগিক বাগর্থের সকল প্রান্তকে ধারণ করতে পারে না। এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য প্রয়োগতত্ত্বের সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান আলোচনায় যেহেতু প্রয়োগতত্ত্বকেন্দ্রিক কোনো বিশ্লেষণে যাওয়া যাবে না তাই এ নিয়ে বিস্তৃত আলোকপাতের সুযোগ নেই। তবে, প্রবাদের এই বৈশিষ্ট্যটি এর বাগর্থতাত্ত্বিক দিকসমূহ অনুধাবনে আমাদের সহায়তা করবে।

তিন

ভাষার অধিবাগর্থ বিষয়ক আলোচনায় অভীষ্ট ভাষা এবং সেই ভাষা ব্যবহারকারীরাও বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে থাকে। কেননা, একটি ভাষিক অনুষঙ্গকে সঠিক বলে স্বীকৃতি দেওয়া, আবার কোনো একটিকে বাতিল করবার যে এখতিয়ার পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার রয়েছে তার দার্শনিক মূল্য অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক। প্রবাদের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি আরও বেশি গুরুত্ব বহন করে এই জন্য যে, কোনো একটি পদবন্ধ বা বাক্য প্রবাদ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে কি হবে না তা নির্ধারণ করবার ক্ষমতা কিন্তু কেবল সংশ্লিষ্ট ভাষা এবং সেই সূত্রে সে ভাষা ব্যবহারকারীদের রয়েছে। এ কারণে প্রশ্ন জাগে, একটি প্রবাদ, যেমন : 'অতিদর্পে-হতলঙ্কা'কে কীভাবে প্রয়োগযোগ্য বলে নির্ধারণ করা হলো এবং কীভাবে এর বাগর্থ হিসেবে 'অহঙ্কার ধ্বংস ডেকে আনে' কাঠামোটির ব্যবহার স্বীকৃতি পেল।

এই প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া সহজ হবে যদি বিমূর্ত ভাষার (abstract language) ধারণাটি বিবেচনা করা হয়। সাধারণভাবে বলা যায় যে, বিমূর্ত ভাষায় এক গুচ্ছ বাক্য থাকে যাদের জন্য সীমিত আকারে সুনির্দিষ্টভাবে বাগর্থ নির্ধারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, মনে করা যাক একটি বিমূর্ত ভাষায় 'অতি দর্পে হত লঙ্কা' বলে একটি বাক্য রয়েছে কিন্তু তার বাগর্থ হিসেবে নির্ধারিত আছে : 'বিশ্বাসে যা পাওয়া যায় যুক্তি-তর্কে তা হারিয়ে যায়' (*???*)। আমাদের কাছে অসামঞ্জস্যপূর্ণ এই উদাহরণের সাহায্যে বলা যায় যে, বিমূর্ত ভাষার বাক্য ও বাগর্থের এই সম্পর্ককে সঠিক ও ত্রুটিহীনভাবে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে দায়িত্ব পালন করে সংশ্লিষ্ট ভাষা ব্যবহারকারী-দল। তারাই প্রবাদটির বাগর্থ সংশোধন করে 'অহঙ্কার ধ্বংস ডেকে আনে' কাঠামোটি ব্যবহারের স্বীকৃতি দেয়। তাদের সংশ্লিষ্টতার ফলেই একটি বিমূর্ত ভাষা ধীরে ধীরে প্রকৃত ভাষা (actual language) হয়ে ওঠে (লুইস, ১৯৭৫; শিফার, ১৯৯৩)। তাহলে এ কথা বলা যায় যে, প্রকৃত ভাষা হলো বিমূর্ত ভাষার সঙ্গে ভাষা ব্যবহারকারীদের সম্পর্ক। ভাষা ব্যবহারকারীরা তাদের প্রয়োজন অনুসারে এই পারস্পরিক সম্পর্ককে যাথার্থ্যের ভিত্তিতে সঠিক ও গ্রহণযোগ্য করে তোলে। অর্থাৎ, বাংলা ভাষাগোষ্ঠী কোনো একটি ভাষিক অনুষঙ্গ যেমন : শব্দ পদ বাক্য তথা প্রবাদের বাগর্থ নির্ধারণ করে তাদের গোষ্ঠী-পরিসরে সংশ্লিষ্ট ভাষিক অনুষঙ্গটি কীরূপে স্বীকৃত তা বিবেচনার মধ্য দিয়ে। বিষয়টিকে সাধারণীকৃত করে বলা যায় যে, ভাষা দর্শনের বিভিন্ন প্রপঞ্চ যেমন : বাগর্থ, সত্য-শর্ত প্রভৃতি ভাষা ব্যবহারকারীদের তত্ত্বাবধানেই নির্ধারিত, নিয়ন্ত্রিত ও নির্দেশিত হয়। তাই কোনো একটি ভাষা ব্যবহারকারী দল *দ*-এর কাছে একটি বাক্য *ব*-এর বাগর্থ *অ* হবে তবে তাতে সুনির্দিষ্ট শর্তারোপও আবশ্যক। বিষয়টিকে স্বীকার্য আকারে নিচে দেখানো যেতে পারে :

> স্বীকার্য-৪ কোনো একটি ভাষিক দল *দ* বাগর্থ বিষয়ক কোনো নিয়ম প্রণয়ন করবার লক্ষ্যে যদি *ব* নামক বাক্যের বাগর্থ *অ* নির্ধারণ করে তবে তাতে অবশ্যই শর্ত *শ* (*ব*, *অ*, *দ*) প্রযুক্ত হবে।

প্রসঙ্গত, বাংলা প্রবাদের উদাহরণ ব্যবহার করা যেতে পারে। নিচে, অত্যন্ত সুপরিচিত একটি প্রবাদ উল্লেখ করে দেখানো হয়েছে যে, কীভাবে প্রবাদের বাগর্থ নিরূপণে ভাষিক গোষ্ঠী শর্ত আরোপ করে থাকে :

৯. রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।

প্রবাদটির বাগর্থ নির্ধারণে বাংলা অঞ্চলের মানুষের বিবিধ বহিঃশক্তির বহু যুদ্ধের স্মৃতি উলুখাগড়ার রূপকাভাসে উপস্থাপিত হয়েছে। আর এর মধ্য দিয়ে যে বাগর্থ নির্ধারিত হয়েছে তা হলো : দুই পক্ষের বিবাদে তৃতীয় পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই চিরায়ত সত্যকে যখন উদাহরণ-৯ নির্দেশিত বাক্য কাঠামোতে ধারণ করা হয় তখন মূলত বাক্য কাঠামোটি বাঙালি ভাষাগোষ্ঠীর নিজেদের অভিজ্ঞতাসঞ্জাত ভূয়োদর্শন নির্ধারিত শর্ত দ্বারা নির্দেশিত হয়। লক্ষণীয় যে, উল্লিখিত শর্তের কারণেই মূলত একটি বাক্য প্রবাদের বহিরাবরণ প্রাপ্ত হয়। কেননা, ভাষাগোষ্ঠী যখন কোনো শর্ত আরোপ করে তখন তা আরোপের কৌশল হিসেবে তারা তাদের অভিজ্ঞতার রসে জারিত করে রূপক কিংবা প্রতীকের আশ্রয়ে সংহত অবয়বে বাক্যটিকে উপস্থাপন করে। এর ফলে, ভাষা গোষ্ঠী কর্তৃক সুনির্দিষ্টভাবে শর্ত আরোপিত সুগঠিত বাক্য কাঠামোই প্রবাদের মর্যাদা পায়।

অনুধাবন করা কষ্টসাধ্য নয় যে, এটি বিপরীতক্রমেও সংঘটিত হতে পারে। অর্থাৎ, ভাষা ব্যবহারকারীদের কাছে পরিচিত কোনো শর্তও একইভাবে ওই নির্দিষ্ট ভাষাদলে কোনো বাগর্থতাত্ত্বিক ধারণা প্রণয়নে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। বিষয়টি ব্যাখ্যা করবার জন্য আমরা আবার স্বীকার্য ৩-কে বিবেচনা করব। স্বীকার্য ৩-এ বলা হয়েছিল, কোনো বাক্য *ব* সত্য হবে যদি এবং কেবল যদি এর বাগর্থ *অ* হয়। এখন প্রশ্ন হলো, অনুবাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি কেমন হবে। বলা প্রাসঙ্গিক যে, প্রবাদ বাক্যের সঙ্গে অনুবাদের নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। মানব যোগাযোগের অন্যতম প্রক্রিয়া অনুবাদ। যখন কোনো পাঠকৃতি (text) অনুবাদ কার্যক্রমে অংশ নেয়, তখন উৎস-পাঠকৃতিতে প্রবাদ বাক্যের উপস্থিতি থাকলে তাকে প্রবাদ বাক্য হিসেবেই অনুবাদ করবার প্রয়োজন যেমন হতে পারে, তেমনি প্রাঞ্জল অনুবাদ প্রক্রিয়ার উপায় হিসেবে উৎস-ভাষার কোনো দীর্ঘ বক্তব্যকে লক্ষ্য-ভাষায় প্রবাদের সাহায্যে সমন্বিত অবয়বে প্রকাশ করবার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। প্রবাদের অনুবাদ প্রক্রিয়ায় বাগর্থের ভূমিকা নিরূপণ তাই আবশ্যক। টারস্কির (Tarski, ১৯৫৬) মত অনুসারে বলা যায় যে, অনুবাদের সময় উৎস-ভাষার বাগর্থ *অ* এর স্থানটি পূরণ করা হয় লক্ষ্য-ভাষার বাক্যের সাহায্যে এবং যদি তা একইসঙ্গে সত্য-শর্ত দ্বারা অভিহিত হয় তবেই তা লক্ষ্য ভাষায় সঠিকভাবে সুনির্ধারিত হয়। এভাবে এই অভিমতের সূত্র ধরে স্বীকার্য ৩-কে পুনর্মূল্যায়ন করে বলা যায় :

স্বীকার্য-৫ যদি একটি বাক্য *ব* এর বাগর্থ দাঁড়ায় *অ* সেক্ষেত্রে *ব* সত্য হবে যদি এবং কেবল যদি *অ* হয়।

কিন্তু লক্ষণীয় যে, এই স্বীকার্যেও অনুবাদের অবস্থানটি স্পষ্ট নয়। *অ* কি আসলে অনূদিত ভাষার বাক্য না কি অনূদিত ভাষার বাক্যের বাগর্থ? নিচের উদাহরণদুটি আমাদের আলোচনার জন্য বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক।

১০. ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না।

১১. Look before you leap.

উদাহরণ ১০-কে উদাহরণ ১১-এর বঙ্গানুবাদ বলা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ইংরেজি বাক্যটির বাগর্থ হলো বাংলা বাক্যটি; আর ইংরেজি বাক্যটি বাংলাভাষীদের কাছে তখনই সত্য হবে যদি এবং কেবল যদি ইংরেজি বাক্যটি এই বাংলা বাগর্থই ব্যবহার করে। অর্থাৎ, বাংলা বাক্যটির শাব্দিক ও পদগত বিন্যাস প্রকৃতপক্ষে কোনো ইংরেজি বাক্যের সত্য-শর্ত পূরণ করে না; এই গূঢ় দায়িত্বটি পালন করে বাংলা বাক্যের বাগর্থ। তাহলে বলা যায় যে, ভাষা ব্যবহারকারীদের বাগর্থের ধারণাটি কীরূপ তার ওপর নির্ভর করেই বাগর্থ বিন্যস্ত হয়। ফলে, ভিন্ন ভাষিক দলে অবস্থান করেও বাংলা ও ইংরেজি ভাষাব্যবহারকারীরা মনস্তাত্ত্বিকভাবে ভূয়োদর্শনগত একধরনের সাদৃশ্য অনুভব করে। এই সাদৃশ্য অনুভবের কারণেই ভিন্ন পদকাঠামো ব্যবহার সত্ত্বেও অভিন্ন বাগর্থতাত্ত্বিক দ্যোতনা সঞ্চারে সক্ষম হয়। বস্তুত, প্রবাদ বাক্যের দ্যোতিত রূপই আসলে প্রবাদের ভাষা-দর্শনকে ধারণ করে রাখে।

ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর আন্তঃসংযোগসূত্রে অনুবাদের মধ্য দিয়ে বাগর্থগত দ্যোতনার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাকে ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করবার লক্ষ্যে এখন একই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত সদস্যের প্রবাদ ব্যাখ্যান প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হবে। সাধারণভাবে, ভাষা ব্যবহারকারীরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে প্রবাদগুচ্ছ ব্যবহার করে থাকে সে সকল প্রবাদের ব্যাখ্যানে যুক্ত হয় তাদের বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি। তা সত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভাষা ব্যবহারকারীরা সঠিকভাবেই প্রবাদের প্রয়োগ করে থাকে। অন্যভাবে বলা যায় যে, ব্যবহারকারীদের ব্যবহারের সূত্র ধরে কোনো একটি প্রবাদের ব্যাখ্যান কী হবে তা নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ, এটি একটি পরস্পরিত প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো একটি প্রবাদকে সংজ্ঞাপিত করা তথা একই গোষ্ঠীভুক্ত অপর ব্যবহারকারী বা ব্যবহারকারীদের কাছে প্রবাদটিকে বোধগম্য করে তোলা। এর জন্য প্রবাদের বাগর্থ নির্ধারণে বক্তা ও শ্রোতা উভয়কেই দক্ষ হতে হয়। প্রবাদ যেহেতু প্রায়শই রূপক, প্রতীক প্রভৃতির আশ্রয়ে উপস্থাপিত হয় সেহেতু সংশ্লিষ্ট প্রবাদ চিহ্নটির বস্তু পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে উভয় পক্ষের বিস্তৃত ও যথার্থ ধারণা না থাকলে প্রবাদের সত্য-শর্ত পূরণ হয় না। কেননা, প্রবাদটি যদি কথক এবং শ্রোতার কাছে বোধগম্যই না হয় তবে তার সত্য স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয় না। তাহলে প্রশ্ন হলো, প্রবাদের দ্যোতিতই কি প্রবাদের প্রাণশক্তি? অন্তত ভাষা-দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রশ্নের হ্যাঁ বোধক উত্তরই দিতে হবে। প্রবাদের বাগর্থগত যে কাঠামোটি ইতোমধ্যে নির্মাণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে তার অন্তঃস্রোতেও রয়ে গেছে এই দ্যোতিতেরই ব্যঞ্জনা।

চার

প্রবাদের বাগর্থ বিষয়ক বিশ্লেষণে এর পাঠকৃতিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন চিহ্নের আলোচনা প্রাসঙ্গিকভাবেই এসে যায়। লক্ষ করা গেছে যে, প্রবাদের পদ-কাঠামো অপেক্ষা এর দ্যোতনা মানবিক সংজ্ঞাপনে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই বক্তব্য থেকে এরূপ অনুকল্প গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই যে, প্রবাদের পদগত কাঠামোয় পরিবর্তন আনলেও তাতে মূল দ্যোতনা সঞ্চারে তা বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। কেননা, ইতোমধ্যে উদাহরণ ৬-এর সাহায্যে দেখানো হয়েছে যে, পদগত পরিবর্তন প্রবাদের সংজ্ঞাপন সামর্থ্য নষ্ট করে দেয়। সুতরাং, প্রবাদের অন্তর্লীন ভাষা-দর্শনের মূল সূত্র এর দ্যোতনা সঞ্চারের মধ্যে নিহিত হলেও যে

সুনির্দিষ্ট পদ কাঠামোতে একটি প্রবাদ কোনো ভাষিক গোষ্ঠীতে গৃহীত হয় তাকে পরিমার্জন কিংবা পরিবর্তন করবার সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে। এর মূল কারণ হলো, ওই সুনির্দিষ্ট পদ কাঠামোতেই যে বাগর্থতাত্ত্বিক দ্যোতনা প্রবাদটি সঞ্চার করতে সক্ষম সেই পদ কাঠামোর বস্তু পরিপ্রেক্ষিতেই প্রবাদটি সত্য। অর্থাৎ, প্রবাদটির সত্য-শর্ত পূরণ করতে হলে কেবল পদ নিরপেক্ষভাবে একটি বাগর্থ দ্যোতনা থাকলেই চলবে না বরং যে পদবন্ধ ব্যবহার করে প্রবাদটি সুনির্দিষ্ট ভাষা ব্যবহারকারীদের কাছে প্রবাদ হয়ে উঠেছে সে পদবন্ধের সঙ্গেও তার বাগর্থকে সমন্বিত হতে হবে। এ জন্যেই 'কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ' পদবন্ধটি প্রবাদ হয়ে ওঠে, কিন্তু অভিন্ন বাগর্থ বহন করা সত্ত্বেও 'কারও জীবনে সুখ আসে আর কেউ দুঃখে ভাসে' পদবন্ধটি প্রবাদ হিসেবে সত্য-শর্ত পূরণ করতে না পারায় সর্বজনগ্রহণযোগ্য কোনো প্রবাদের মর্যাদা পায় না।

প্রবাদের পাঠকৃতিতে নানা বিন্যাসে পদ-কাঠামো গড়ে ওঠে। পাঠকৃতির এই বিবিধ বিন্যাসকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যেতে পারে : ক) প্রাথমিক সজ্জার পদ-কাঠামো, খ) দ্বৈতীয়িক সজ্জার পদ-কাঠামো এবং গ) ত্রৈতীয়িক সজ্জার পদ-কাঠামো। সাধারণভাবে বলা যায় যে, প্রাথমিক সজ্জার পদ-কাঠামো সংবলিত প্রবাদে সহজ ও আটপৌরে ভাষায় সরাসরি মূল বক্তব্য উপস্থাপিত হয়। এ প্রসঙ্গে নিচের উদাহরণটি বিবেচনা করা যায় :

১২. সময় বহিয়া যায়, নদীর স্রোতের প্রায়।

ওপরের উদাহরণে লক্ষ করা যায় যে, প্রবাদটিতে সময়ের একমুখী বহমানতাকে কোনো প্রকার রূপক কিংবা প্রতীকের আড়ালে না রেখে সরল উপমায় সরাসরি তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু এ জাতীয় সহজ ও একমাত্রিক পদকাঠামোয় বিন্যস্ত প্রবাদের সংখ্যা খুব বেশি নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রবাদ অলংকার গুণসম্পন্ন হয়ে ওঠে এবং একটি পরোক্ষ বাচনশৈলী ব্যবহার করে একাধিক মাত্রায় পদবিন্যাসে নিয়োজিত হয়। এরা মূলত দ্বৈতীয়িক সজ্জায় বিন্যস্ত প্রবাদ। যেমন :

১৩. নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা।
১৪. যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়।
১৫. ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি।

ওপরের প্রবাদগুলো (১৩-১৫) বাংলাভাষীদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত এবং তাদের দ্বারা বহুলব্যবহৃত। লক্ষণীয় যে, প্রতিটি প্রবাদেই ব্যবহৃত হয়েছে প্রতীকায়িত দ্যোতকগুচ্ছ, যারা বাচ্যার্থের সীমায় সরাসরি উপস্থাপিত না হয়ে বিশেষ গূঢ়ার্থকে ধারণ করে আছে। এ কারণে, 'নাচতে না জানা', 'বাঁকা উঠান', 'বাঘ', 'সন্ধ্যা', 'ঘুঘু', 'ফাঁদ' দ্যোতকসমূহ প্রতীকী তাৎপর্যে দ্বৈতীয়িক সজ্জায় সংশ্লিষ্ট প্রবাদের অন্তর্লীন দ্যোতনাকে উদ্দীপিত করে। প্রতীকায়িত হওয়ার কারণেই দ্বি-স্তরবিশিষ্ট এ শ্রেণির প্রবাদের ব্যবহার বহুমাত্রিক এবং মানব জীবনের নানাবিধ তুল্য ঘটনানুষঙ্গকে ধারণ করতে সক্ষম। ব্যবহারকারীরাও অত্যন্ত অভ্যস্ত ও সাবলীল রীতিতে বাচ্যার্থ অনুসৃত পদ-কাঠামোর মোড়কে অসংখ্য জীবনলব্ধ বাচনের গূঢ়ার্থ নির্দেশের উপায় খুঁজে পান এ সকল প্রবাদে। এ ছাড়াও আরও এক ধরনের পদ-কাঠামো প্রবাদের সংগঠনে দেখতে পাওয়া যায়, যা ত্রৈতীয়িক সজ্জার পদ-কাঠামোর

সাহায্যে গঠিত হয়। এ শ্রেণির প্রবাদে মিথিক চিহ্নের সাহায্যে অন্তর্লীন দ্যোতনা সঞ্চারিত হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, নিচের উদাহরণগুলো দ্রষ্টব্য :

১৬. অতি দর্পে হত লঙ্কা।
১৭. নয় মন তেলও হবে না রাধাও নাচবে না।
১৮. মোঘল পাঠান হদ্দ হলো ফারসি পড়ে তাঁতি।

উদাহরণগুলোতে (১৬-১৮) বিভিন্ন মিথিক ও ঐতিহাসিক অনুষঙ্গকে দ্যোতকরূপে ব্যবহার করবার মধ্য দিয়ে বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় প্রবাদগুলোকে প্রয়োগ-উপযোগী করে তোলা হয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে উদাহরণ-১৮-এর আলোকে বলে নেওয়া প্রয়োজন যে, ইতিহাস এবং ঐতিহাসিক ঘটনানুষঙ্গ কালগত দূরত্বে থেকেও ভাষীদের উপলব্ধিতে সুদীর্ঘ অবস্থানের মধ্য দিয়ে ক্রমশ মিথ-তুল্য হয়ে ওঠে। ফলে, মিথিক চিহ্নের পরিধিতে বিভিন্ন ঐতিহাসিক অনুষঙ্গও অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এভাবে মিথ কিংবা ইতিহাস হতে উৎসারিত মিথিক চিহ্নসমূহ প্রবাদের পদ-কাঠামোতে বাচ্যার্থের অন্তরালে আরও দুটি বিন্যাস স্তর তৈরি করে নেয়। মিথিক চিহ্নে 'দর্প', 'লঙ্কা', 'নয় মন তেল', 'রাধার নাচ' প্রভৃতি দ্যোতকসমূহ দ্বৈতীয়িক সজ্জার দ্যোতকদের মতো কেবল প্রতীক নয়; এরা একই সঙ্গে মিথ কিংবা ইতিহাসের চুম্বক-প্রতিনিধি এবং বহুমাত্রিক প্রতীক চিহ্ন। ফলে, ত্রৈতীয়িক সজ্জার পদ-কাঠামো বিন্যাসে বাচ্যার্থের সজ্জা-স্তরটি ক্রমশ গৌণ হয়ে পড়ে। এর পরিবর্তে গূঢ়ার্থ প্রকাশের উপায়রূপে অপর দুটি সজ্জার বিন্যাস ও বাগর্থ দ্যোতনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রবাদের এই পদ-কাঠামোগত বিবিধ বিন্যাস মূলত এর অন্তর্লীন অধিবাগর্থতাত্ত্বিক ভাষা-দর্শনকেই অবয়ব প্রদান করে থাকে। বিভিন্ন ধরনের পদ-কাঠামো সজ্জার প্রধানতম আবেদন প্রবাদের মধ্যে অন্তঃশায়িত দর্শনের কাছে — যেখানে ভাষা, চিন্তন ও ভাষিক মনস্তত্ত্ব জৈব সংশ্লেষের মধ্য দিয়ে সত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটনে নিয়োজিত হয়।

পাঁচ

বর্তমান আলোচনায় মূলত দেখানো হয়েছে যে, প্রবাদের বাগর্থ-বৈশিষ্ট্য কীভাবে সংশ্লিষ্ট পদ-কাঠামোর সঙ্গে সমন্বিত হয়ে ভাষা-দার্শনিক সত্যকে ধারণ করে। বাংলা প্রবাদের অধিবাগর্থতাত্ত্বিক বিবেচনায় এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, একটি প্রবাদকে কোনো ভাষাগোষ্ঠীর ভাষিক সংস্কৃতির সীমায় টিকে থাকতে হলে তাকে যাথার্থ্য এবং সত্য-শর্ত পূরণে সক্ষম হতে হয়। কেননা, প্রবাদসহ মানব ভাষায় ব্যবহৃত কেবল সত্য বাক্য বা বাক্যসমষ্টিই বাগর্থসম্পন্ন হতে পারে। এখানে আরও দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, প্রবাদের পদ-কাঠামো নিবিড়ভাবে এর বাগর্থের সঙ্গে সমন্বয়সূত্র যোজনা করে। প্রবাদের পদ-কাঠামো এক, দুই বা তিন স্তরে সজ্জিত হয়ে এর অন্বিষ্ট বাগর্থকে সত্য-শর্তে যাথার্থ্য গুণ প্রদান করে। প্রবাদ যেহেতু সমভাষিক মানবদলের পারস্পরিক যোগাযোগের আকর্ষণীয় উপায় সেহেতু এর প্রয়োগ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণেরও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। তবে এর জন্য স্বতন্ত্র আলোচনা প্রয়োজন। বর্তমান আলোচনার সূত্র ধরে সবশেষে বলা যায় যে, ভবিষ্যতে আরও ব্যাপকতর ভাষাবৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে বাংলা প্রবাদের বিভিন্ন সূক্ষ্মতর বৈশিষ্ট্যের প্রতি আলোকপাত করা সম্ভব।

সহায়ক গ্রন্থ

সুভাষ ভট্টাচার্য। (১৯৯৩)। *সংসদ বাগধারা অভিধান*, কলকতা : সাহিত্য সংসদ।

Davidson, D. (1967) 'Truth and meaning'. *Synthèse*, 17, 304–23.

Davies, Martin. (2003). 'Philosophy of Language' In N. Bunnin and E.P. Tsui-James (eds), *The Blackwell Companion to Philosophy*, Second Edition, Oxford : Blackwell Publishers, 90–146.

Lewis, D. (1975). 'Languages and Language'. In K. Gunderson (ed.), *Language, Mind and Knowledge*, Minneapolis: University of Minnesota Press.

Schiffer, S. (1993). 'Actual-language relations'. In J.E. Tomberlin (ed.), *Philosophical Perspectives, 7 : Language and Logic*, Atascadero, CA : Ridgeview Publishing Company, 231–58.

Tarski, A. (1956). 'The concept of truth in formalized languages'. In A. Tarski, *Logic, Semantics, Metamathematics*, Oxford : Oxford University Press, 152–278.

Zamir, Muhamed. (2010). *Anthology of Bengali Proverbs and Bachans*, Dhaka : Bangla Academy.